চতুর্থ অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

অনুরূপা বিশ্বাসের আত্মজীবনী : 'নানা রঙের দিন'

নারীর আত্মজীবনীর প্রেক্ষাপটে তাঁর জীবন ও সাহিত্যের সমান্তরাল পাঠ যেখানে আমাদের আলোচনার বিষয়, সেখানে অনুরূপা বিশ্বাসের মত সংবেদনশীল, *'ইতিহাস মানবী'* আত্মজীবনীকারের *'নানা রঙের দিন'* এর আলোচনা ব্যতীত তা কখনই সম্পূর্ণতা পেতে পারে না। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিশিষ্ট সাহিত্যিকার এই মানবী তাঁর আত্মজীবনীতে কেবল তাঁর দ্বারা যাপিত জীবনের একটি নির্দিষ্ট কালের কিছু টুকরো ঘটনাকেই তুলে আনেন নি, বরং এই অনবদ্য আত্মকথনটি হয়ে উঠেছে এক বহুস্তরাধিত বহুমাত্রিক সাহিত্যসৃষ্টি, যাতে সময়ের প্রবহমানতায় ব্যক্তি ও সমাজ মানসে ঘটে যাওয়া নানা বৈচিত্রময়তা শিল্পগুণান্বিত রূপ নিয়ে উঠে এসেছে। চল্লিশের উত্তাল গণসংগ্রাম, জঙ্গি ছাত্র আন্দোলন, সামন্ততান্ত্রিক শাসন ও সংস্কার উপড়ে ফেলার প্রচেষ্টা, কৃষকদের জঙ্গী সংগ্রাম প্রমুখ বিষয় যখন অনুরূপা বিশ্বাসের আত্মকথায় স্থান পেল তখন তা বিশেষতা পেল মুখ্যত দুটি কারণে। এক, প্রান্তিক বরাক উপত্যকার সীমিত পরিসরের প্রেক্ষাপটে এমন অদ্ভুত সময়ের গ্রন্থনা সম্ভবত এর পূর্বে বাস্তবায়িত হয়নি এবং দ্বিতীয়ত এখানে আত্মজীবনীকার একজন নারী। অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্যের ভাষায়-

"বিশেষত রচয়িতা যখন নারী, তাঁরা লেখেন বিপুল পুরুষ পরিসরের 'বাহির' থেকে – প্রতিমুহূর্তে দৃশ্য ও অদৃশ্য প্রতিষেধের প্রাচীর ভাঙতে ভাঙতে তাঁর এগিয়ে আসা।"[১]

অর্থাৎ অনুরূপা বিশ্বাসের *'নানা রঙের দিন'* নারী এবং বরাক উপত্যকা-

এই দুই প্রান্তিকায়িত পরিসরের আত্মকথা।

লেখিকার আত্মজীবনীর বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে লেখিকার সাথে আমাদের পরিচিত হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। অনুরূপা বিশ্বাসের জন্ম বিশ শতকের প্রথমার্ধে ১৯৩২ সালে। এই সময়কালটা ভারতের ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ কালপর্ব। তিরিশের দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতা যখন চল্লিশের দশকে আরও প্রবল আকার ধারন করল, তখন একদিকে বৃটিশের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর স্বাধীনতা আন্দোলন, অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে তৈরী হওয়া রাজনৈতিক, সামাজিক অস্থিরতা, দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, নতুন দেশ নির্মাণ প্রমুখ ঘটনাবলী গোটা ভারতের জনগণের সাথে অনুরূপা বিশ্বাসের শৈশব ও কৈশোরকেও প্রভাবিত করেছিল। চল্লিশের দশক থেকে অনুরূপা নিজে ব্যক্তিগতভাবে রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়ার দরুণ এই প্রভাব আরও দৃঢ় হয় তবে কেবল রাজনীতির দিক থেকেই নয়, তাঁর জীবনী সমাজ ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবেও গুরুত্ব দাবি করতে পারে। অনুরূপার জন্ম ও কর্মভূমি যেহেতু বরাক উপত্যকা; তাই এই অঞ্চলের সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস জানতে যেমন তাঁর জীবনী সহায়কের ভূমিকা পালন করে, তেমনি বরাক উপত্যকার নারীদের সামাজিক অবস্থা, নারী শিক্ষার বিস্তার ও বিবর্তনের ইতিহাসটিও খুব স্বাভাবিকভাবেই এতে জায়গা করে নেয়।

সমাজ ইতিহাস, রাজনৈতিক ইতিহাসের দিকটি ছাড়াও কবি, রাজনৈতিক কর্মী, সংগঠক অনুরূপা বিশ্বাসের ব্যক্তি বিকাশের ধারাটিও যে কম বৈচিত্রময় নয় এর প্রমাণ উঠে আসে তাঁর *'নানা রঙের দিন'* এর বিশ্লেষণী পাঠের মধ্যে দিয়ে। জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ সংস্কারবাহী ঘরের মেয়ে হয়েও কিভাবে ঘরের গণ্ডি ভেঙে তিনি নিতান্ত অল্প বয়সে রাজনীতির টানে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তারপর অজ্ঞাতবাসের জীবনেই পরিবারের অজ্ঞাতে অসবর্ণ পাত্রের সাথে বিবাহ। পুনরায় পরিবারে প্রত্যাবর্তন। উচ্চশিক্ষা গ্রহণ। চাকুরীলাভ। একাধিক পদ্য ও গদ্য গ্রন্থের প্রকাশ। সংগঠক হিসেবেও সাফল্যময় জীবন। তার সাথে পরিবারের সঙ্গে নিজেকে

মানিয়ে নেওয়ার চিত্তাকর্ষক জীবন অভিজ্ঞতা– সব মিলিয়ে *‘নানা রঙের দিন’* যেন বিচিত্র রঙের ছটা।

অনুরূপার জন্ম হয় ১৭ই জুন, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে হাইলাকান্দি শহরের পোস্ট অফিস কোয়ার্টারে। শ্রদ্ধেয় হরমোহন রায়চৌধুরী ও প্রমীলা সুন্দরী দেবীর আট ছেলে মেয়ের মধ্যে ষষ্ঠতম সন্তান হলেন অনুরূপা। পিতা ও মাতার প্রভাব অনুরূপায় স্পষ্ট। পূর্ববঙ্গ থেকে বিতারিত হয়ে আসা উদ্বাস্তু হিন্দুদের পুনর্বাসনের লড়াই-এ নিজেদের আত্মীয় পরিজন স্বজাতিদের পাশে দাঁড়াতে যথাসম্ভব প্রচেষ্টা করেছিলেন অনুরূপা বিশ্বাসের পিতা। লেখিকার ভাষায়–

“বিংশ শতাব্দীর ভোরে আধুনিক কালকে বাস্তবায়িত করতে মূলত বেঁচে থাকার জন্য জীবিকার্জন করতে গিয়ে যাঁরা অরণ্য প্রকৃতির বিরূপতাকে জয় করতে নিয়ত যুদ্ধ করেছেন- গ্রাম উচ্ছিন্ন জীবনকে অজানা অচেনা বিপজ্জনক পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন– তেমনই এক বিরল যোদ্ধা আমার জন্মদাতা পিতা।”[২]

অন্যদিকে অনুরূপা বিশ্বাসের মাতা শ্রীমতি প্রমিলা সুন্দরী দেবী ছিলেন শিলচরের বিখ্যাত পণ্ডিত সূর্যকুমার তর্ক সরস্বতীর জ্যেষ্ঠ সন্তান। সমাজের অবরোধে প্রমিলা দেবী স্কুলের যেতে না পারলেও বাবা সূর্যকুমার তর্ক সরস্বতীর টোল শিলচর চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের কাছ থেকে লেখা পড়া কিছুটা শিখেছিলেন এমন কি শেষজীবনে প্রমিলাদেবীর স্মৃতি কথা লেখার আগ্রহ জেগেছিল অনুরূপা তাঁর আত্মজীবনীতে একথাও লিখেছেন। আসলে প্রমিলাদেবী ছিলেন একজন আধুনিক মনষ্ক ও কঠোর পরিশ্রমি ব্যক্তিত্ব। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে মেয়েদের শিক্ষা ও স্বনির্ভরতার প্রতি উদ্যোগের পাশাপাশি প্রচলিত সামাজিক কঠোর অনুশাসনের থেকে মেয়েদের মুক্ত করতে হবে। সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন ঘরের সীমিত পরিসরে অবস্থান করেও। যখন অনুরূপার দিদি অমিয়বালা মাত্র বাইশ বছর বয়সে বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে

আসে তখন তাঁর জন্য বিধান হয় যে দিনে শুধু একবেলা ভাত খেতে পারবে। কোলে দেড় বছরের মেয়ে নিয়ে অমিয়াবালার জন্য যখন এই বিধান কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে তখন প্রমিলাদেবী প্রশ্ন তোলেন–

''দেখাও কোন কোন শাস্ত্রে বলেছে স্বামী মারা গেলে স্ত্রী শুধু একবেলা খাবে।''[৩]

প্রমিলা সুন্দরী দেবীর মত আধুনিক মনষ্ক, সংস্কারমুক্ত, তেজস্বিনী চরিত্রের মাতা ও হরমোহন রায়চৌধুরীর মত পরিশ্রমি, কঠোর ও উদার ব্যক্তিত্বের পিতা হিসেবে পেয়েছিলেন বলেই সম্ভবত অনুরূপা বিশ্বাসের ব্যক্তিত্বের ভিত এতটা সুদৃঢ় হতে পেরেছিল। মাতা-পিতার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে তাই অনুরূপা কণ্ঠে শোনা যায় –

"এমন প্রতিবাদী চরিত্র তেজস্বিনী মায়ের মেয়ে হয়ে আমার গর্ব আছে, যেমন গর্ব আছে আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার এই সুদূরবর্তী পাণ্ডব বর্জিত দেশের গোড়ার দিককার পত্তনে আমার বাবাও ছিলেন একজন রূপকার এই কথা ভেবে।'[৪]

হরমোহন প্রমিলার স্বল্প আয়ের সংসারে অভাব অনটন থাকলেও শিক্ষার অগ্রাধিকার ছিল সবসময়। অনুরূপার সহোদরদের কেউই নিয়মিত শিক্ষার থেকে বঞ্চিত হয় নি। পরিবারের ভাইবোনদের শিক্ষা অনুরাগের পরিবেশে অনুরূপার শিক্ষাজীবন বিকশিত হয়। তাঁর শিক্ষাজীবনের পরিসর ছিল বহুব্যপ্ত। তাঁর শিক্ষার আরম্ভ শিলচরের জয়কুমার পাঠশালা থেকে। সিলেটের কিশোরী মোহন গার্লস হাইস্কুল থেকে তিনি প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাশ করেন। সিলেটের উইমেনস্ কলেজ থেকে ১৯৪৮ আইএ পাশ করেন অনুরূপা আবার দেশভাগের ফলে ১৯৪৯ সালে জিসি কলেজে ভর্তি হন ডিগ্রি ক্লাসে। ধীরে ধীরে জড়িয়ে যান রাজনীতিতে। তারপর ১৯৫৩ সালে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পাশ করেন, ১৯৬৫ সালে পাশ করেন বাংলায় এম.এ.। নানা সামাজিক পরিবর্তন অনুরূপার শিক্ষার স্থান পাল্টে দিয়েছে, কিন্তু তার পরিধি সীমায়িত করতে পারে

নি। প্রথাগত শিক্ষার বাইরেও অনুরূপা পড়াশুনা চালিয়ে ছিলেন।

৮০র দশক থেকে নর্মাল স্কুলের প্রাচীন পুঁথি পত্র ঘাটতে থাকেন। গভীর অধ্যয়নে অনেক প্রাচীন পুঁথির পাঠোদ্ধার করেন এবং ১৯৯৬ সালে 'কৌতুক বিলাস' নামে পুথি সম্পাদনা করেন। ৬৫-তে এম.এ. পাশ করবার পর অনুরূপা যুক্ত হয়েছিলেন অধ্যাপনার কাজে। ১৯৬৬ সালের জুলাই মাস থেকে কাছাড় কলেজের অস্থায়ীপদে কিছুদিন অধ্যাপনার কাজ করেছেন অনুরূপা। ১৯৬৮ সালের ১৫ই জুলাই স্থায়ীভাবে যোগদান করেন শিলচর মহিলা কলেজে। এই কলেজ থেকেই ১৯৯২ সালে তিনি অবসর গ্রহন করেন।

অনুরূপার সবচেয়ে বড় পরিচিতি কবি হিসাবেই। অনুরূপার কাব্য প্রতিভা ছিল অসাধারণ। কবিতা ছাড়াও গদ্য-প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনায়ও তাঁর কৃতিত্ব অবশ্য স্বীকার্য। তবে অনুরূপার প্রথম এবং সর্বোত্তম পরিচয় তিনি কবি। কবি হিসাবে আপন সত্তার অনুসন্ধান পিপাসা যে অনুরূপার ছিল তাঁর কবিতায়ই রয়েছে তার প্রমাণ। অনুরূপার *'কিছু কিছু বৃক্ষ আছে বলে'* কাব্য গ্রন্থের *'আমার কাঙ্খিত মুখ'* কবিতাটি যেমন —

"অজানা অদেখা এক নদী শুধু বয়ে যায়
হিজলের গুঁড়ি দিয়ে বাঁধা ঘাট, জলে ভেজা পচা ছাল
মরা রং শ্যাওলা পিছল —
সরু মোটা ধাপগুলি মাড়িয়ে ছাড়িয়ে
কতোদিন কলসীতে জল ভরলাম।
সকাল বিকাল কাটে যেমন তেমন, তবু
কলসীতে ধরা জলে তৃষ্ণা তো মেটেনা
ধাপ বেয়ে জল ছুঁতে যাই বার বার
ভরা ঘট কাঁখে ফের ঘাটে গিয়ে বসি
'জলকে চলার' ডাকে সাড়া দিতে যাই

সে আমাকে ডেকেছে যে প্রিয় নাম ধরে
হাত ভিজিয়ে জলের নাগাল যদি পাই
টোল-পড়া ঢেউগুলি গুনতে গুনতে
দু'একটি ফুটি-ফুটি তারা যদি উঁকি মেরে দেখে
আমাকে ও আমার এই আদেখলাপনা কে
নিশ্চিত তা'হলে
আমি সেই তারার তিমিরে
আমার কাঙ্খিত মুখ ঠিক দেখে নেবো।''[৫]

'অজানা অদেখা নদী'টির প্রবাহ যেন জীবন প্রবাহ বা চলমান জীবন। 'হিজলের গুড়ি দিয়ে বাঁধা ঘাট' – একজন মানুষের জীবনের সামাজিক গন্ডিগুলি। আর *'যেমন তেমন সকাল বিকাল কাটা'* আমাদের গতানুগতিক জীবন। গতানুগতিক জীবন আমাদের প্রকৃত জীবন তৃষ্ণা মেটাতে পারেনা। কবি সত্তা প্রকৃত জীবন তৃষ্ণা মেটাতে *'জলকে চলার'* ডাকে সাড়া দিতে চায় অর্থাৎ জীবন প্রবাহে গা ভাসাতে চায়। কবিতার ব্যাখ্যা যেভাবেই করিনা কেন এখানে একটা দিক পরিষ্কার এখানে কবি *'কাঙ্খিত মুখ'* অর্থাৎ *'ব্যক্তি সত্তা'র* অনুসন্ধানী। আর আত্মজীবনী কারও জীবনের স্মৃতি রোমন্থনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিসত্তাকে বা আত্মাকে খুঁজে বেড়ান। তবে কবিতা আর আত্মজীবনী এক বস্তু নয়। কবিতায় যেখানে কবি নিজের ক্ষণিকের ভাবকে প্রকাশ করেন সেখানে আত্মজীবনীতে জীবনী কার জীবনের একটা বৃহৎ পর্যায়ের ব্যক্তিবিকাশের ধারাটিকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেন। তবে এর নির্দিষ্ট কোন মানদণ্ড নেই।

'কিছু কিছু বৃক্ষ আছে বলে' কাব্য গ্রন্থের *'আমার কাঙ্খিত মুখ'* কবিতা পড়ে এটা অন্তত বোঝা যায় কবি অনুরূপা *'নানা রঙের দিন'* আত্মজীবনী গ্রন্থ লিখতে বসার পূর্বেই ব্যক্তিসত্তার অনুসন্ধানী ছিলেন।

অনুরূপার *'নানা রঙের দিন' 'অনুষ্টুপ'* শীত গ্রীষ্ম সংখ্যায় ১৪১১ বঙ্গাব্দে

(২০০৪ সালে) সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। তবে অনুরূপা এর দশ বছর পূর্ব থেকেই লিখতে শুরু করেছিলেন। অনুরূপা বিশ্বাসের কথায়–

''লিখতে আরম্ভ করেছিলাম বছর দশক আগেই হবে। খুব একটা গোছানো নয়, টুকরো টুকরো স্মৃতি — আমার ছেলেবেলার। এই শতকের গোড়ার দিকে সেগুলো একটু একটু করে সাজাতে বসি। ২০০৩-এ অনেকদিন পর আবার যোগাযোগ হলো সুরমা ঘটকের সঙ্গে। কথায় কথায় আমার আত্মকথা বিষয় জেনে সে-ই বললে যে লেখাটি *'অনুষ্টুপ'* সম্পাদকের কাছে পাঠাতে। পুজোর ছুটিতে বড়ছেলে অনুপ বাড়ি অসলে তার হাত দিয়ে পান্ডুলিপি তৈরী করে পাঠিয়ে দিলাম। *'অনুষ্টুপ'* শীত গ্রীষ্ম সংখ্যা ১৪১১ য় সে লেখা বেরোলে পর যারা পড়তে পারলেন তাদের উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে বাকি অংশ ধীরে ধীরে লিখতে শুরু করলাম।''[৬]

'নানা রঙের দিন' লিখতে শুরু করবার বহুপূর্বে অনুরূপা *'আপন কথা'* নামে একটি খন্ডিত আত্মকথা লিখেছিলেন যার লেখার সময় ১৯৫৪ সাল। আপনকথা নিয়ে অনুরূপা পরবর্তী সময়ে বেশিদূর এগোননি তবে *'নানা রঙের দিন'*-এর পূর্বপ্রেক্ষিত বুঝতে *'আপনকথা'*-র গুরুত্ব অপরিসীম বলেই মনে করি।

১৯৫৪ সাল 'আপনকথা'র রচনা কাল। অনুরূপার জীবনের দিকে যদি লক্ষ্য করি তবে দেখবো অনুরূপার বয়স তখন বাইশ বছর। অনুরূপার অজ্ঞাতবাস জীবন পর্বের সমাপ্তি ঘটে ১৯৫০ সালে। কমরেড কার্ত্তিক বিশ্বাসের সঙ্গে রেজিষ্ট্রি বিয়ে ১৯৫২ সালে হবার পর উভয়ের যৌথজীবনের সূচনা ঘটেছে তখন। ভারতবর্ষের সামাজিক, রাজনৈতিক ইতিহাস সেই সময়ও উত্তাল। দেশ ভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগে সাধারণ মানুষের স্থানান্তরের বেদনা তখনো কমেনি। এমনি সময়ের ফসল অনুরূপার *'আপন কথা'*।

বাইশ বছরের তরুণী অনুরূপা *'আপন কথা'র* শুরুতেই আমাদের চমকে দেয়।

"বাংলার মেয়েদের আপন-কথা পাথর চাপা হয়ে বুকের মধ্যে জমা থাকতো এতোদিন এ যুগ জীবনে এসেছে দুযোর্গের খরাবন্যা। মেয়েদের ঘরের আঙ্গিনা ছাড়িয়ে ধূলিরুক্ষ পথে টেনে এনেছে ... জীবন -সংগ্রামের জয়-পরাজয়ের শানবাধানো কঠিন শিলাপথে আছড়ে পড়েছে হাজার অভিযোগ, অশ্রুজল আর বিদ্রোহ ... এ দেশের মেয়ে সত্যই অনন্যা।''[৭]

অনুরূপা নিজেকে একক নয় সমষ্টির মধ্যে পেয়েছেন। সেই সমষ্টি হল বাংলার সর্বশ্রেণীর বর্ণের মেয়েরা। চল্লিশের দশক, যুগ জীবনে যে দুর্যোগ এনেছিল তাতে করে ভারতীয় সমাজের কাঠামোতে কিছুটা পরিবর্তন এসেছিল। ঘরের গন্ডী ভেঙে অনেক মেয়েরাই রাজনৈতিক, সামাজিক কর্মযজ্ঞে অংশ নিয়েছিল। এতে করে মেয়েরা বাইরের পৃথিবীর আঙিনায় নিজেদের পরখ করে নেবার সুযোগ পেয়েছিল। *'বাংলার নারী-আন্দোলন'* গবেষণা গ্রন্থে ছবি বসুর লেখনিতেও একই কথা ফুটে উঠেছে। সমাজের জমিদারী প্রথা ও জমিদারতন্ত্রী মনোভাবের প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন —

"মধ্যযুগীয় এই বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গি আজ বিশ শতকের বিপ্লবমুখর দিনগুলিতেও অভ্যাসবশেই সনাতনকে বজায় রাখবার চেষ্টা করছে। পুরাতন যৌথ পরিবার, ভারতীয় সতী নারীদের অলৌকিক মহিমা, সহনশীলতা, জননীত্ব, নারীত্ব — এমনি অনেক আর্যব্যবস্থার নজির দিয়ে এরকম দৃষ্টিভঙ্গি সমগ্র নারী জাতির চিরন্তন সর্বহারাত্বকেই বজায় রাখতে দৃঢ়সংকল্প। তবু, ইতিহাস সেই পক্ষে যেখানে সংগ্রামী ও মুক্তিকামী নতুন প্রাণশক্তি পুঞ্জিত হচ্ছে। প্রতিক্রিয়ার অন্ধ দুর্গ ভেঙে জাতীয় আন্দোলনের সর্বাঙ্গীন পুরিপূর্ণতার পথে গণ-আন্দোলনের বলিষ্ঠ প্রাণব্যঞ্জনায় জন্মাচ্ছে ও জন্মাবে স্বাধীন বাঙলার সত্যিকারের স্বাধীন ও সুস্থ মেয়ে।''[৮]

বাইশ বছরের অনুরূপাও যুগবদলের এই প্রেক্ষিতকে চিনতে পেরেছিলেন। যুগের পরিবর্তন এসেছে। *'বাল্যে পিতার অধীনে, যৌবনে স্বামীর অধীনে*

এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীনে' ক্ষয়িষ্ণু সমাজের এই উক্তিতে নারীকে আর সংজ্ঞায়িত করা যায় না। নারী কলম ধরে আপন কথা লিখতে বসে তাঁর অস্তিত্বের বিপর্যয় কে উপলব্ধি করে। সমাজকে বার্তা দেবার সময় এসেছে। *'আপন কথা'* লিখতে অনুরূপা সেই বার্তাই দিয়েছেন —

"আজ লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে বারবার — আমি এই মাটি, এই আকাশ — বাতাসের উদার স্নেহে লালিত একটি মেয়ে, আত্মসংস্কৃতিতে মননের দীপ্তিতে কোমল কঠোর মেশা এই যে সোনার মাটিতে যুগে যুগে কতো কাহিনী রচনা হয়েছে।

সাহিত্যের মধ্যে এ মেয়ের মর্মবাণীকে ফুটিয়ে তোলার প্রচুর সাধনা রয়েছে সৃষ্টির অন্তঃশীল প্রবাহে যারা জীবপালিনী তারা এ গৌরবের অধিকারকে যতটা না বুঝতে পারতেন আজ যতো দিন কাটছে তা স্বচ্ছ হয়ে উঠছে — দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে উঠছে আপন অধিকার বোধ।"[৯]

কেবল নিজের কথা বলা নয় সময়ের প্রেক্ষাপটে আত্মউদ্‌ঘাটন আত্মজীবনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। তরুনী অনুরূপার আপনকথা এই বৈশিষ্ট্য কে পুরণ করে। 'আপন কথা'য় অনুরূপার চোদ্দবছর থেকে বাইশ বছর বয়সের মধ্যবর্তী সময় কালের মানস বিবর্তনের পর্যায়টি ধরা পড়েছে। এই সময়ই অনুরূপা কমিউনিষ্ট ভাব ধারায় অনুপ্রাণীত হয়ে সমাজ বদলের সংগ্রামে লিপ্ত হয়। *'আপন কথা'য়* অনুরূপা রাজনৈতিক জীবনের পূর্ণ পরিচয় না দিলেও সমাজের নীচুতলার মানুষদের সংস্পর্শে এসে জীবনকে যে নতুন করে চিনতে শিখেছেন তিনি তার কথা বলেছেন।

তরুণী অনুরূপা সুচারু ভাবে তার মানসবিবর্তনের ধারাটির পরিচয় দিয়েছেন। রাজনীতিতে প্রবেশ অনুরূপার সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার সেদিন মেনে নিতে পারেনি। লিখেছেন– *"আমায় বকে-বুঝিয়ে সব উপায়ে দমিয়ে দিতে চাইলেন"*[১০] *কিন্তু সবলা নারীচেতনার টান সব বাঁধাকে ভেঙে দিল — "তখন কি আর এ বেগকে রোখা যায়?"*[১১]

এমন অবস্থায় দেশ ভাগের কালোছায়া গ্রাস করে অনুরূপার জীবনকে।

"ঘটনার পর ঘটনা ... রাজনৈতিক বিপর্যয় ... এলো দেশ ভাগাভাগি ... জীবনের উপরও এলো পরিবর্তনের নির্দেশ।"[১২]

দেশ ভাগের পর শিলচর প্রত্যাবর্তন ঘটলে স্থানীয় কমিউনিষ্ট নেতৃবর্গের সঙ্গে রাজনৈতিক কর্মে লিপ্ত হন অনুরূপা। স্বাধীন দেশের সরকারের দমন নীতিতে সে সময় কমিউনিষ্ট দল নিষিদ্ধ হলে যেতে হয় অজ্ঞাতবাসে। অজ্ঞাতবাসের জীবনে চা বাগানের শ্রমিক, কৃষক শ্রেণীর অধিকার রক্ষার আন্দোলনে অনুরূপা নিম্ন শ্রেণীর খেটে খাওয়া মানুষদের অনেক কাছে আসতে পারার অভিজ্ঞতা অনুরূপার, আপন কথায় ধরা পড়েছে। অনুরূপার নারী সত্ত্বা জাগ্রত হয়ে ওঠে।

"এ বিপ্লবী কর্ম প্রয়াসের মধ্যে দেখতে পেলাম বিরাট মেয়ে সমাজের বন্ধন মুক্তিকে ... যুগ যুগ সঞ্চিত লাঞ্ছনার, অবদমনের কঠিন শিলাচলে যেন নেমে এসেছে মুক্তিঝোরার ধারা আর মেঘমন্দ্রিত নূপুর শুনছিলাম উন্মুখ হয়ে। মনে প্রাণে এ বিশ্বাস করেছিলাম ... তাই শত শত মা-বোনের কাছে গিয়েছি, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় কথা কয়েছে, দেখেছি বঞ্চনার অথৈ পাথার আজ আর হার মানতে চাইছে না দুরন্ত বাঁধ ভাঙা প্লাবনে ভেসে পড়তে চাইছে, তাই পিছন না চেয়ে পথে পথে রক্ত দিয়ে মুক্তি স্বপ্নের আল্পনা রেখে গেছে এ মাটির কল্যাণী-অনন্যারা; নিজের সন্তানের ক্ষুধার অন্ন, স্বাচ্ছন্দ জীবন, ভবিষ্যৎ কাল, আত্মাধিকার, স্বামী-পুত্র নিয়ে শান্তির সংসার পাবার কামনায় তাঁরা চলার পথ এঁকে গেছেন — সেই জীব পালনী শক্তি ধারিণীদের কল্যাণী হৃদয় আমার বিদ্রোহী কাঠিন্যে আনলো আরো নতুন সুর। মেয়ে সত্তাকে আরো নতুন করে যেন দেখতে পেলাম।"[১৩]

মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে হয়ে সমাজ বদলের নেশায় ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসা। যুগের বাস্তবতায় নিজেকে ঝালিয়ে নেবার প্রচেষ্টা অনুরূপাকে একটা মসৃণ জীবন দেয়নি। লিখেছেন —

"গতানুগতিকতাকে যেদিন অস্বীকার করেছি সেদিনই জানতাম এ ঝড় আমার জীবনে আসবে। তবু প্রশ্ন জেগেছে বার বার, নিজের সত্যকে বিবেকের আয়নায় বারবার পরখ করতে হয়েছে।"[১৪]

অজ্ঞাত বাসের জীবনে বিকোলাই জ্বরের প্রকেপে অনুরূপা যখন মৃত্যুপথযাত্রী, তখন বাড়ির নিষেধ সংস্কার অমান্য করে রাজনীতিতে প্রবেশ করা মেয়ের প্রতি সমস্ত ক্ষোভ ঝেড়ে ফেলে পুলিশি ধরপাকরের ভয়কে অগ্রাহ্য করে মা প্রমিলাদেবী মেয়ের পাশে এসে দাঁড়ান। আসলে সমাজ বদলে তরুণ প্রজন্মের সংগ্রাম, জীবনকে বাজি ধরা, সমাজ বাইরে থেকে অস্বিকার করতে চাইলেও ভেতরে ভেতরে স্বীকৃতি দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যেমন পরিণত বয়সে সবুজের অভিযানে তারুণ্যের জয়গানই গেয়েছেন। সমাজ মানসিকতাও তাই। অনুরূপা জাগ্রত মনে সেই সত্যকে পর্যবেক্ষণ করেছেন।

"আমার জীবনের এ এক পরম আবিষ্কার। মুক্তিব্রতের কঠিন দীক্ষায় নানা জাতির নানা স্তরের অনেক মেয়ের মধ্যে একদিন প্রাণের যে বিচিত্র প্রকাশ দেখেছিলাম — তারই সঙ্গে মিলিয়ে আজ মাতৃসত্তার এক বিজয়িনী রূপ অন্তর ভরে দেখেনিলাম।"[১৫]

অজ্ঞাত বাসের জীবন শেষ হয় ১৯৫০এ। এই সময় পার্টির নীতি বদলে পার্টি ওপর সরকারে দমন নীতির অবসান ঘটে। অনুরূপার জীবনেও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের চঞ্চলতা কমে আসে। কিন্তু সমাজ বদলের নেশা তো ফুরায়নি। এরইমধ্যে ১৯৫২তে পার্টি সহকর্মি কার্তিক বিশ্বাসের সঙ্গে রেজিষ্ট্রি ও যৌথজীবনের সূচনা। ২২ বছরের অনুরূপার মনে যে দ্বন্দের প্রকাশ ঘটায় আপন কথায় তার প্রকাশ ঘটেছে —

"আমি ভাবছি কি করে সংহত করবো নিজেকে — পরিবার আর রাজনীতি। ... আমার জীবন এ এক দ্বন্দ্বময় মুহূর্ত।"[১৬]

অনুরূপা কেবল সংশয় দ্বন্দতেই আটকে না থেকে জীবনের গতির আন্দাজ দিয়েছিলেন আপন কথায়।

"আমি নারী, জীবনের পূর্ণতাবোধের প্রত্যাশা নিয়ে, ব্যক্তি ও সমষ্টির জীবনের মুক্তিকামনায় চলছি সামনে ... আমার নারীত্বের অমর্যাদা আমি করতে পারি না — আমার মধ্যে যে সমস্ত চাওয়া অনুভব করছি, ছোট - বড়ো মিলিয়ে ... সে সবার মাঝখানে নিজেকে দেওয়া আর ফিরে পাওয়া নারীত্বের মর্মকথা।"[১৭]

অনুরূপার মানস বিবর্তনের এই স্বীকৃতি আপন কথায় লিপিবদ্ধ হয়ে আপন কথার গুরুত্ব বাড়িয়ে তোলে।

'নানা রঙের দিন' অনুরূপা লিখতে বসেছেন জীবন সায়াহ্নে এসে। আর আপন কথা লিখেছিলেন ২২বছর বয়সে। মাঝে প্রায় ৫০ বছরের পার্থক্যে অনুরূপার জীবনে নানা রঙের সমাবেশ ঘটে বলতেই পারি। ২২ বছর বয়সে জীবনের ঘটমান প্রবাহে অনুরূপার যে জীবন অভিজ্ঞতা জন্মেছিল তার বিকাশ কতটা ঘটেছে অনুরূপার বাকি জীবনে সেই পর্যায়টাকে বুঝতে নানা রঙের দিনের পূর্ব প্রেক্ষিত হিসাবে আপনকথার গুরুত্ব অপরিসীম হবে বলে আমার বিশ্বাস।

উনিশ শতকের গোড়া থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ধীরে ধীরে ভারতীয় সমাজে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। পাশ্চাত্যের দুয়ার উন্মোচনে দীর্ঘ দিনের সমাজের ঘুনধরা কাঠামো গুলি প্রকট হলে প্রতিনিধি স্থানীয়, পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে আলোকিত কিছু পুরুষ সে দিন সমাজ বদলের সংগ্রামে নেমেছিলেন, আমরা সে ইতিহাস জানি। তবে ব্যতিক্রমি কিছু ঘটনা ছাড়া ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান ছিল সেই তিমিরেই। বাংলা সাহিত্যের প্রথম আত্মজীবনীকার রাসসুন্দরী দাসী (১৮০৯-১৯০০) মায়ের মৃত্যুশয্যায় যেতে না পেরে *'আমার জীবন'* (১৮৭৬) এর পাতায় আক্ষেপ করেছেন — *"আমার নারী কুলে কেন জন্ম হইয়াছিল?*

আমার জীবন ধিক্ ... এমন যে দুর্লভ বস্তু মা এই মায়ের সেবা করিতে পারি নাই। আহা আমার এ দুঃখ রাখিবার কি স্থান আছে? আমি যদি পুত্রসন্তান হইতাম আর মা-র আসন্ন কালের সম্বাদ পাইতাম, তবে আমি যেখানে থাকিতাম, পাখির মতো উড়িয়া যাইতাম। কি করিব, আমি পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গী।''[১৮]

আসলে সমাজে তখনও নারীর ক্ষমতায়ণ ঘটেনি। নারীকে ঘরের গন্ডিতে গতানুগতিক জীবনই যাপন করতে হত। মেয়েদের শিক্ষার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, প্রথম যুগে ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়েরাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। শিক্ষিত মন তাদের নতুন দৃষ্টি দিয়েছিল। ঠাকুর পরিবারের স্বর্ণকুমারী দেবী এদের মধ্যে অন্যতম। প্রতিভাময়ী এই মহিলাই মেয়েদের মধ্যে প্রথম গভীর গবেষণা পূর্ণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মূলক *'পৃথিবী'* নামে বইটি লেখেন। *'ছিন্নমুকুল'*, *'বসন্ত উৎসব'*, *'গাথা'*, *'নব কাহিনী'*, *'মিবার রাজ'*, *'বিদ্রোহ'*, *'স্নেহলতা'*, *'ফুলের মালা'* ইত্যাদি প্রায় সাতাশ খানি বই তিনি রচনা করেছেন। সাহিত্য সাধনায় বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করেন স্বর্ণকুমারী তাঁর *'ভারতী'* পত্রিকা সম্পাদনায়। ঠাকুর পরিবারেরই আরেক নারী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী প্রচলিত সমাজ ধারার বিপরীতে স্বামীর সঙ্গে বিদেশে যান। এক্ষেত্রে যদিও সত্যেন্দ্রনাথের উৎসাহই ছিল প্রধান। কুচবিহারের মহারাণী সুনীতি দেবী লন্ডনে গিয়ে পড়াশুনা করেন। তিনি ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম নারী যিনি ইংরেজিতে নিজের জীবনী *'Autobiography of an Indian Priences'* লেখেন। তবে এসব ছিল বিচ্ছিন্ন ঘটনা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও ভারতীয় সমাজে নারীর সেই অর্থে ক্ষমতায়ন ঘটেনি। উনিশ শতকের শেষের দিক থেকে জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রভাবে কিছু কিছু মেয়েরা ঘরের গন্ডিভেঙে জাতীয় জীবনে নিজেদের উৎসর্গ করতে এগিয়ে আসেন এদের মধ্যে স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবী, পন্ডিতা রমাবাই (১৮৫৮ - ১৯২২) এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সরলা দেবী স্বদেশী যুগে *'লক্ষীর ভান্ডার'* নামে স্বদেশী দ্রব্য বিক্রির একটি

কেন্দ্র স্থাপন ক'রে স্বাদেশিকতা প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করে ছিলেন। এছাড়াও স্বদেশী যুগে গান রচনা, দেশের যুবশক্তির স্বাস্থ্যের উৎকর্ষের জন্য ব্যায়াম সমিতি স্থাপন ও বীরাষ্টমী মেলার ব্যবস্থা করে যুব সমাজের অবিসংবাদী নেত্রী হয়ে উঠেছিলেন সরলা দেবী। অন্যদিকে পশ্চিম মহারাষ্ট্রের মেয়ে পন্ডিতা রমাবাই ১৮৮২ সালে পুনায় স্থাপন করেন *'আর্য মহিলা সমাজ'*। ১৮৮২ সালেই শিক্ষা কমিশনের সাক্ষ্যে ভারতীয় মেয়েদের সার্বিক শিক্ষার প্রসার ও বিশেষভাবে মেডিক্যাল কলেজগুলিতে মেয়েদের ভর্তির দাবিতে সওয়াল করে পন্ডিতা রমাবাই। ১৮৮৩ সালে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে রমাবাই ইংল্যান্ডে যান। এপিস্কোপাল চার্চের নিমন্ত্রনে ১৮৮৬ সালে তিনি যান আমেরিকায়। শিশু বিধবাদের লেখাপড়া শেখাবার উদ্দেশ্যে স্কুল গড়ার কাজে রমাবাইকে সাহায্য করার জন্য তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্যে সেখানে একটি অ্যাসোসিয়েশন তৈরী হয়। ১৮৮৯ সালে মুম্বাইয়ে রমাবাই প্রতিষ্ঠা করেন বিধবাদের জন্য আবাসন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান *'সারদা সদন'*। মহারাষ্ট্রে এটিই ছিল বিধবাদের প্রথম আবাসস্থল। তবে সরলাদেবী কিংবা পন্ডিতা রমাবাই এর জীবনেও বিরোধের অবস্থান ছিল। সরলাদেবী স্বাধীন ভাবে নিজের জীবন নির্ধারণ করতে পারেন নি। বিবাহ না করার সিদ্ধান্তকে পরিবারের সংস্কারের চাপে পরিবর্তন করতে হয়।[১৭] পন্ডিতা রমাবাই - এর ধর্মান্তর গ্রহণ ও উগ্র নারীবাদী মতামত জাতীয়তাবাদী নেতাদের ক্ষোভের মুখে পড়েছিল।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ভারত বিশেষত বাংলার সমাজ জীবনে এক জনচেতনার জোয়ার এনেছিল। এতদিন শিক্ষিত তথা সমাজের উচ্চশ্রেণীর মেয়ে দেরই দেখা গিয়েছিল সমাজের প্রচলিত স্রোতের বিপরীতে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসতে কিন্তু বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন বাংলার গ্রাম গুলির প্রত্যন্ত অঞ্চলের মেয়েদেরকেও ঘরের বাইরে নিয়ে এসেছিল। বাংলার মেয়েরা সেদিন জাতীয় নেতাদের ডাকে অরন্ধন ব্রতপালন করে, মৈত্রীর প্রতীক রূপে *'রাখী বন্ধন'* উৎসব

পালন করে, এমনকি মিছিল করে, গান গেয়েও এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিল। বঙ্গভঙ্গের পরবর্তী যুগে ধীরে ধীরে জাতীয় আন্দোলনে মেয়েদের আরও বেশী করে অনুপ্রবেশ ঘটতে শুরু করে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে চরকা কাটা, স্বদেশী কাপড় ফেরি করা, ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষদের স্বদেশীয়ানায় উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে বাংলার মেয়েরা এগিয়ে এসেছিল। তবে বিরোধের অবস্থান সে যুগেও ছিল। রাসসুন্দরীর ঠিক একশো বছর পরে যাঁর জন্ম সেই সৈয়দা মনোয়ারা খাতুন (১৯০৯-১৯৮১) আত্মজীবনীতে লিখেছেন রাস্তায় নেমে বয়কট — পিকেটিং আন্দোলনে যোগ দিতে না পেরে তাঁর আক্ষেপের কথা। মনোয়ারার ভাষায়– *"শুধু এই টুকুতে যেন তৃপ্তি হয় না। আরও করবার জন্য প্রাণটা উসখুস করে। কিন্তু কেন আমরা পারি না? আমাদের কথা কেউ শোনে না, শুধু অবরোধের প্রাচীরে মাথা কুটে মরবার জন্যই আমাদের সৃষ্টি না কি? ফ্রান্সের চাষার মেয়ে জোয়ান অব আর্ক যা যা করেছিল আমরা ভদ্রলোকের মেয়ে হয়ে তা পারি না কেন?"*[২০] মনোয়ারার 'আমরা' শব্দটি প্রয়োগে বোঝা যায় বিরোধটা কেবল ব্যক্তি কেন্দ্রিক ছিল না। গান্ধিজীর নেতৃত্বে অসহযোগ, আইন অমান্য আন্দোলনেও ভারতীয় মেয়েরা পূর্ণ সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছিল। তবে দীর্ঘ দিনের সমাজ মানসিকতায় নারীর গৃহবন্দি জীবনের অবসান সর্বস্তরের ভারতীয় জীবনে ছিল অলীক স্বপ্ন। উত্তাল চল্লিশের দশক সেই সমাজ মানসিকতায় বড়সর আঘাত হানতে পেরেছিল। একদিকে ভারতীয় জীবনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাব, ভারতবাসীর স্বাধীনতা অর্জনের লড়াই, আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রগতি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, কমিউনিষ্ট দলগুলির শ্রমিক, কৃষকের অধিকার দখলের লড়াই চল্লিশের দশককে সরগরম করে তোলে। চল্লিশের এই উত্তাল সময় মেয়েদের কেও উৎসাহিত করে ঘরের গতানুগতিক জীবনকে বর্জন করে জাতীয় জীবনে নিজেকে উৎসর্গ করতে। *'নানা রঙের দিন'* এরকম একজন ভারতীয় নারীর জীবন আলেখ্য। চল্লিশের উত্তাল সময় অনুরূপাকে ঘরের বাইরে টেনে এনেছিল। *'নানা রঙের দিন'*—এ চল্লিশের দশকে জাতীয়জীবনে

নিজেকে উৎসর্গ করা একজন মেয়ের জীবনের ওঠা পড়ার কাহিনী। কেবল চল্লিশের দশক নয়, বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও একজন ভারতীয় নারী কিভাবে নিজের ব্যক্তি সত্তার জাগরণের লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছিলেন তার সন্ধান দেয় অনুরূপা বিশ্বাসের *'নানা রঙের দিন'*।

নারীর প্রতি সমাজ মানসের দীর্ঘ দিনের অবহেলার, অবজ্ঞার বেদনা অনুরূপার মধ্যে ছিল। নিজের মার প্রসঙ্গে অনুরূপা জানিয়ে ছিলেন, বংশ গরিমায় শিক্ষায় মায়ের পরিবার এগিয়ে ছিলেন। সেই পরিবারে ইংরেজি শিক্ষাকেও সাদরে গ্রহন করা হয়েছিল কিন্তু তা শুধুমাত্র ছেলেদের বেলায়। অনুরূপার মা প্রমিলা সুন্দরী দেবী শিলচরের বিখ্যাত পন্ডিত সূর্যকুমার তর্ক সরস্বতীর কন্যা হলেও এবং প্রমিলা দেবীর জন্মের পূর্বেই শিলচরে মেয়েদের মিশন স্কুল স্থাপিত হলেও প্রমিলা দেবীর স্কুলে পড়া হয়নি। লেখিকার কথায়– *"এমনই ছিল সমাজের অবরোধ।"*[২১] অনুরূপার পিতৃবংশেও নারীর অবস্থান ছিল চিরাচরিত সমাজিক অবরোধের আড়ালে ঢাকা। নিজের জেঠিমা ও জেঠতুতো বউদিদের পরম্পরাগত জীবন অনুরূপার সংবেদনশীল চোখে এভাবে ধরা দেয়— *"জেঠিমা শান্তশিষ্ট, ছোটখাট গড়নের — নাতিনাতনি সমালানো ছিল তাঁর কাজ। রান্নাবান্না, ধানভানা জল আনা যাবতীয় গৃহস্থালির কাজ করতেন আমাদের হাস্যমুখি বড়বউদি। ... সদ্য বিয়ে হওয়া মেজোবউদির দাম্পত্য জীবন বলতে কিছু নেই তবু যেন কোন দুঃখ নেই। সারাদিন বড়জায়ের সঙ্গে সংসারে ঘানি টানা — সারা মুখে খালি হাসি। কখনও খিলখিলিয়ে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়তেন একেবারে। এই ঢেঁকিতে ধান কুটছেন তো জল আনছেন কলসি ভরে। সুন্দরদা সংসার করেননি। কিন্তু অমন প্রাণবন্ত বউটিকে সন্দেহ করতেন তাঁর সজীব উচ্ছলতার কারণে। বউদি গায়ে মাখতেন না, অদ্ভূত আচরণে সহ্য করতেন। তো, সেই দাদা বাঁচলেন না বেশি দিন, মুখে রক্ত উঠে মারা গেলেন। বৌদির পরনে আগে থাকত মোটা সুতোর কোরা লাল পাড় শাড়ি এক প্যাঁচে পরা — সায়া ব্লাউসের বালাই নেই।*

খালি গা তবু কী সুন্দর করে গুছিয়ে পরতেন তাঁরা। শালীনতার একটুও হানি হত না। এখন একেবারে সাদা থান, কোঁকড়ানো চুলের রাশিতে আগেও তেল থাকত না, অযত্নে অবিন্যস্ত সর্বদাই। এখন সেই চুলের রাশি নির্দয় ভাবে কেটে দেওয়া হল। রুক্ষ চুলে জট এমনিতেই বেঁধে থাকত। বরং আপদ বিদেয় হল। আমাদের গ্রাম-দেশে সদ্য যুবতী বিধবার এই দশা তখন। তারা সংসারের বোঝা যেন। এই সংসারে কত রকমের মেয়ে দেখলাম তাঁরা সবাই সংসারের হাঁড়িকাঠে মাথা রেখে এমনি ধূসর বর্ণহীন জীবন কাটিয়ে গেলেন নির্বিবাদে। তাঁদের যে নিজস্ব কিছু আশা ভরসা সুখ বা আনন্দ ছিল পাবার — ছিল একান্ত নিজের করে কিছু দেবার ও তা তাঁরা বুঝতে পারতেন কিনা তাও জানতে পারিনি।’’[২২] অনুরূপার বড় চার বোন পড়াশুনা করলেও নিতান্ত অল্প বয়সে তাদের বিয়ে দেওয়া হয়। বড় বোন অমিয় বালার পাঠশালা পাঠের পরেই বিয়ে হয়ে যায়। অমিয় বালার বিবাহিত জীবন সম্পর্কে অনুরূপা লিখেছেন —*“দিদিকে বিয়ে হয়ে গিয়ে বালিকা বয়সেই ধান ভানতে হয়েছে ভেবে কেমন জানি কষ্ট হল। এছাড়াও দেখলাম ঘরের কোণে ছোট্ট খাঁচার মতো ঘুপচি মাচান কেটা ভগ্নপ্রায় হয়ে আছে। জিজ্ঞেস করে জানতে পেলাম ওটাকে ‘খাটাল’ বলে। নতুন বউকে প্রথম প্রথম শ্বশুরবাড়ি এসে খাটালে বসে থাকতে হত। কত যে উদ্ভট নিয়ম সব ছিল! খাটাল শুনলেই গোরু মোষের খাটালের কথা চট করে মনে আসে। তখন বারো-তেরো বছর বয়স হবে দিদির। উদয়াস্ত খাটতে হত। বিয়ের পর নতুন থাকতে খাটালে লোকজন দেখতে এলে লম্বা ঘোমটার নীচে চোখ বুজে থাকতে হত। বয়স্করা আসতেন, তাঁদের দিকে চেয়ে থাকতে নেই তাই চোখ বুজে থাকা — ওঁরা নিজেরা ঘোমটা তুলে মুখ দেখে আবার নামিয়ে দিতেন।’’*[২৩] অনুরূপার মেজদি রাণি ভট্টাচার্য। মেজদিরও বিয়ে হয় অল্প বয়সে মেট্রিক দেবার পূর্বেই। মেজদি রাণী ভট্টাচার্য্য বিবাহ পরবর্তী জীবনের কথা জানাতে লিখেছেন, *“শ্বশুর-শাশুড়ি, দেওর-ননদ মিলিয়ে মোট দশজনের সংসার, জোয়াল পড়ল ঘাড়ে। এইটুকুন বয়স— রাঁধাবাড়া,*

কুয়ো থেকে জল তুলে বাসন মাজা — যাবতীয় গৃহস্থালির কাজ চেপে বসল তার উপর। ঝি কাম রাঁধুনির বাঁধা কাজে মেজদি প্রসংসা পেল ঠিকই, পেল না সুখ স্বাচ্ছন্দের সামান্যতম আরাম— বিশ্রাম ছিল না তার এই জীবন চক্রে।''[২৪]

সেজদি বাণী ভট্টাচার্য কবিতা লেখা, সংগীত চর্চায় প্রতিভাশালী ছিলেন। কিন্তু ক্লাস টেনে উঠতেই তারও হঠাৎ করে বিয়ে হয়ে যায়। ছোড়দি সতী ভট্টাচার্যের বিয়ে হয় মেট্রিক দেবার পর কোলকাতায় চাকুরিজীবী ছেলের সঙ্গে। তবে স্বামীর সঙ্গে থাকা নয় গ্রামে শ্বশুর বাড়িতে থেকে তাকেও এক দুঃসহ জীবন যাপন করতে হয়। অনুরূপার চোখে ছোড়দির নতুন বিবাহিত জীবন এভাবে ধরা পড়েছে — *"ভোরে সবার ঘুম ভাঙার আগে উঠে উঠোন ঝাঁটপাট দেওয়া, গোবর ছড়া দিয়ে বাসন কোসন মেজে ঘরদোর নিকিয়ে, তারপর বারবাড়ির পুকুরে ডুব দিয়ে চুল ভিজিয়ে চান করে কাঁখে কলসি-ভরতি জল নিয়ে বাড়ি আসা — তারপর ভিজে কাপড়চোপড় ছেড়ে রোদে মেলে দিয়ে রান্নাবান্নায় লেগে যাওয়া। ওই সময় দেখেছি গ্রাম-দেশের বাড়িতে মেয়েরা পায়খানাও সাফ করত। বাঁশের ঝাড়-ঘেরা বাড়ির পেছন দিকে সামান্য আড়াল দেওয়া একটা পরিষ্কার উঠান মতো জায়গা থাকত। সেখানেই সারা বাড়ির লোক নিত্যকর্ম সারতেন। ওই জায়গার নাম ছিল 'আচাল'। আচাল পরিষ্কার করা ছিল বাড়ির বউদের দায়িত্ব। ঝি চাকর মেথর কাম রাঁধুনি সবই হতে হত বাড়ির বউকে। কী যে দুঃসহ জীবন।''*[২৫]

অনুরূপার পারিবারিক পরিমন্ডলে মেয়েদের এই অবহেলিত জীবন এত গুরুত্বের সঙ্গে কেন স্থান পেল *'নানা রঙের দিন'*-এ মনে প্রশ্ন জাগায়। অনুরূপা কি নিজের জীবন অন্য সুরে বাঁধতে চেয়ে ছিলেন? *'নানা রঙের দিনে'*-এর বহু পূর্বে অনুরূপার বাইশ বছর বয়সে লেখা আপন কথায় তার ইঙ্গিত রয়েছে– *"অতি সাধারণ বেশবাস— চোখে মুখে এক আত্মচেতনার সবল অভিব্যক্তি ... আমি আকৃষ্ট হলাম, সে আমায় কাছে টেনে নিল। জানতাম মেয়েটি সাম্যবাদী দল ভুক্তা। তার মধ্যে আমি দেখলাম সেই 'সবলা' নারী চেতনার ঝিলিক্, এক ঝাঁকুনি দিয়ে*

জেগে উঠলো আমার সত্য আমার আত্মাধিকার চাওয়া মন ঝুঁকলো, বন্ধুত্বের অচ্ছেদ্য বন্ধনে পড়লাম জড়িয়ে।''[২৬]

আসলে অনুরূপা ঘরের গন্ডিতে নিজের জীবনকে বাঁধতে চাননি। সিলেটের কিশোরীমোহন বালিকা বিদ্যালয় থেকে ১৯৪৬ সালে মেট্রিক প্রথম বিভাগে পাশ করে বোনদের মধ্যে প্রথম তিনি কলেজে যাবার সুযোগ পান। ভর্তি হন সিলেটের উইমেনস্ কলেজে। সেখানেই 'সবলা' নারী চেতনা আকর্ষণ ও আত্মাধিকার চাওয়া মন তাকে সাম্যবাদী দলের সংস্পর্শে নিয়ে আসে। দেশ তখন ১৬ই আগষ্ট ১৯৪৬ এ শুরু হওয়া সর্বনাশা দাঙ্গায় জ্বলছে। আপন কথায় অনুরূপা লিখেছেন — *"কলকাতায় তখন ১৬ই আগষ্টের সর্বনাশা দাঙ্গা চলছেঃ মানবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ আমার কলেজ-পড়া মনে লেগেছে মর্মান্তিক আঘাত — যুক্তি মানছে না হৃদয়কে, হৃদয় মানছে না যুক্তিকে ... সে আমায় সাহায্য করলে — যোগালে আমার জিজ্ঞাসার উত্তর ... আমি ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়লাম। কর্মক্ষেত্রে আবার শুরু হলো নতুন করে চেনা — জানা, আমার হাতে খড়ি এক নতুন পৃথিবীর সন্ধান — অভিযানে। পরিবারের চোখের আড়ালে আমার পাঠ্য জীবনের সাথে শুরু হলো রাজনৈতিক জীবন।''*[২৭] সিলেটে বাস কালে পড়াশুনার সাথে পরিবারের বাঁধাকে অগ্রাহ্য করেই অনুরূপা পার্টির হয়ে প্রচার পুস্তিকা বিক্রি, চাঁদা তোলার কাজ করে গেছেন। দেশ ভাগের পর ১৯৪৮-এ শিলচরে ফিরে এসে পার্টির কর্মপন্থায় অনুরূপা আবার আত্মনিয়োগ করেন। চা বাগান, রেলের শ্রমিক শ্রেণী, কৃষকদের ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে সামিল হন। এরই মধ্যে পুলিশি ধরপাকরের কারণে অনুরূপাকে পার্টির নির্দেশে অজ্ঞাত বাসে যেতে হয়। অজ্ঞাত বাসের জীবন অনুরূপাকে তাঁর কাঙ্খিত স্বাধীনতা দিতে পারেনি। তাই আক্ষেপের সুরে অনুরূপাকে বলতে শুনি— *"আত্মগোপন করে আছি, একে কি অবাধ জীবন বলে? এটা কি মুক্তি হতে পারে? অথচ আগে ভেবেছি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেই আর কোন বাঁধা থাকবে না।''*[২৮] এখানেই শেষ নয়

অজ্ঞাত বাসে বড়খলার ভিতরগঙ্গাপুরের মনিপুরি বস্তিতে থাকাকালীন মনিপুরি গ্রাম সমাজ তাঁর একলা মেয়ে পরিচয় মেনে নিতে পারেনি। অনুরূপাকে বশ্যতা স্বীকার করতে হয়। অনুরূপা ব্যথিত হৃদয়ে লিখেছেন— *"ঘর ছেড়ে, সমাজ ছেড়ে বেরিয়ে ব্যাপক কৃষি জীবনের মাঝখানে গিয়েও দেখলাম সমাজ নামক যন্ত্রটির প্রবল অস্তিত্ব বিরাজমান। ... আপন সমাজ পরিবেশ ছেড়েছুড়ে চলে গিয়ে ভেবেছিলাম জীবন হবে অবাধ, একেবারেই অন্যরকম। তা কিন্তু হল না। ওদের মধ্যে গিয়েও এক ব্যাপারে স্বস্তি মিলল না। বুঝতে পারলাম, আমার মতো মেয়েকে ওখানে থাকতে হলে একটা সামাজিক পরিচয় থাকলে ওদের পক্ষে গ্রহণ করতে সুবিধা হয়। কারও মেয়ে বা বউ হিসাবে দেখতেই তারা অভ্যস্ত। তাদের বলতে হল এরকম সম্পর্কের কথা এবং সম্পর্কটাকে ওদের চোখে পাকা করতে গ্রামেই পার্টি বর্ধিত সভায় পার্টি সদস্য এবং বাছাই করা গ্রামবাসীদের সামনে আমাদের বিবাহিত বলে ঘোষণা করা হল। সাক্ষী রইল গ্রামের মানুষ আর অবারিত প্রকৃতি। দিনটি ছিল ১৯৪৯ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর। কোনও আচার অনুষ্ঠান নয়। নয় কোন উৎসব।*

গ্রামবাসী জনতা আর প্রকৃতিকে মেনে আমরা জীবন সাথী হলাম সেদিন থেকে। শেষ পর্যন্ত সমাজ নামক অদৃশ্য শক্তি ধরের কাছে হার মানতেই হল যদিও সচেতন ভাবে এই সত্যকে অগ্রাহ্য করেই চলেছি আমরা।"[২৯] এভাবেই সেদিন সমাজের চোখে নিজের একলা মেয়ে পরিচয় ঢাকতে পার্টি সহকর্মি কমরেড কার্তিক বিশ্বাসের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল অনুরূপার। অজ্ঞাত বাসের জীবন শেষের পর ১৯৫২ সালে পারিবারিক সহমতে কার্তিক বিশ্বাসের সঙ্গে নিজের রেজিষ্ট্রি বিয়ে হবার পূর্বে অনুরূপা নিজের নারী সত্তা অবদমনের চিন্তায় শঙ্কিত হয়েছিলেন। *"সংসার জীবনে ঢুকে পায়ে শিকল বাঁধা পড়বে কিনা এমন শঙ্কা মাঝে মাঝে ভয় দেখাত। দ্বন্দ্ব ছিল মনের ভেতর বাইরে ছিল প্রতিকুলতার শক্ত প্রাচীর। তাই বিয়ে ব্যাপারে দোটানায় পড়েছিলাম। যদিও দুজনের মধ্যে পারস্পরিক*

বোঝাপড়ায় কোন ফাক ছিল না। মিলিত জীবনের স্বপ্ন ছিল দুজনারই মনে। তবু পা ফেলতে কত যে দ্বিধা! যন্ত্রনায় বিদ্ধ হই প্রতিনিয়ত। পার্টি কর্মি হিসাবে নিজের দায়দায়িত্ব অবহেলা করতে পারি না অন্য দিকে ব্যক্তি জীবনের অসম্পূর্ণতা নিয়ে ক্ষোভ দুঃখে জর্জরিত হই।'[৩০] স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্বময়ী অনুরূপাকে বিবাহিত জীবনের প্রতিবন্ধকতার কল্পনা সেদিন শঙ্কিত করেছিল। পার্টি কর্মী হিসাবে নিজের দায়িত্ব তিনি ভুলতে চাননি নিজের ব্যক্তি সত্তাকেও ভুলতে চাননি। দুয়ের দ্বন্দ্বের মাঝেই কমরেড কার্তিক বিশ্বাসের বাবা-মা সহ ভাই বোনের সংসারে অনুরূপার প্রবেশ ঘটে। প্রথমাবস্থায় কিছু সময় নষ্ট হলেও ১৯৫৩ তেই অনুরূপা শ্বশুর বাড়িতে বসেই পড়াশুনা করে বি.এ. পাশ করেন। এর কিছু দিনের মধ্যেই প্রথম সন্তান কাজলের (অনুপ) ও জন্ম হয়। এর পর একে একে আর দুজন পুত্র সন্তানের মা হন অনুরূপা । সন্তানদের মানুষ করবার গুরু দায়িত্বে তাকে চাকরির প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করতে হয়। পার্টিও তার সমালোচনা করে, লিখেছেন *"পার্টি সার্কেলে হুল ফোটানো মন্তব্য ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে আত্মসমর্পণ করেছি আমি।'*[৩১] কিন্তু অনুরূপার ব্যক্তি সত্তার পরাজয় ঘটেনি সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব সন্তান পালনের মাঝে কবিতা লিখে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। লেখেন– *"বিয়ের পর থেকে একের পর এক ছেলের মা হবার পরও অবসরে ডাইরি আর কবিতা লিখে গেছি। সেসব লেখা নিয়ে দ্বিতীয় বই — 'জীবন তোমার শিয়রে' খাতাবন্দী হয়ে রইল। বই এর নামাঙ্কিত কবিতায় লিখেছিলাম 'সারা রাত ধরে জেগে বসে আছি, জীবন তোমার শিয়রে।' সত্যি তখন আমার জেগে থাকার পালা চলছিল একটানা অনেক বছর। বাধ্য হয়ে ঘরবন্দী হয়ে পড়াতে মনের মধ্যে একটা চাপা কষ্টবোধ থাকত। খালি মনে হত, আমি বোধহয় হেরে গেলাম। সংসারের যাঁতা কল থেকে আর বোধহয় রেহাই পাবো না। সারাদিন শ্রান্ত হই, রাতের বেলাও নিশ্চিন্ত ঘুম নেই, তবু কলম ছাড়ি না। রাত্রে বাচ্চারা ঘুমোলে পর কিছু না কিছু*

লিখি, লিখে যাই শুধু নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে।''[৩২] ১৯৬০ এ আসামে 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলন শুরু হলে উগ্র জাত্যাভিমানী অভিযানের নৃশংসতায়, হিংস্রতায় হাজার হাজার বাংলাভাষী মানুষ নির্বিচারে বিতারিত, লুণ্ঠিত হয়ে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছিল কাছাড়ে — বরাক উপত্যকায়। শিলচরে নর্মাল স্কুল ছাত্রাবাস, অধরচান্দ হাইস্কুল, সরকারী বালক ও বালিকা বিদ্যালয়, শিলচর কোর্ট, নরসিং স্কুল ভরে গিয়েছিল দুর্গতের ভিড়ে। বাইরের টান অনুরূপাকে আর ঘরে থাকতে দেয়নি। উদ্যোগী হয়ে তৈরী করেছিলেন 'কাছাড় মহিলা ত্রাণ সমিতি'। লেখিকার কথায় – *"আমার মন চঞ্চল ভীষণ উদ্বিগ্ন, ভাবছি আর তো ঘরে বসে থাকা যায় না। অস্থির হয়ে বেরিয়ে পড়ি। প্রথম গেলাম মামাশ্বশুর উঁপেন্দ্রশঙ্কর দত্ত মহাশয়ের বাড়িতে। মামীমা বাণী দত্তের কাছে। তিনি নারী কল্যাণ সমিতিতে ছিলেন, সামাজিক কাজকর্মে অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমার আগ্রহে সাড়া দিয়ে তিনি রাজি হলেন ত্রাণকার্যে নামতে। দুজনে মিলে সভা ডাকলাম কুলদাসুন্দরী পাঠশালায়, সভাটি হয়েছিল ২২/০৮/১৯৬০ সালে। ঘরভর্তি গৃহিনীদের নিয়ে গড়া কাছাড় মহিলা ত্রাণ সমিতি। সভায় আনুষ্ঠানিক ভাবে সর্বসম্মতিক্রমে সভানেত্রী হলেন বীনা দত্ত। আমি হলাম সাধারণ সম্পাদিকা। সহঃ সভানেত্রী রূপে পেয়েছিলাম পাঁচজনকে — ঊষারাণী চৌধুরী, সুরুচিবালা পুরকায়স্থ (জেলরোড), পুষ্পরাণী মিত্র (জেল রোড), লীনা দত্ত (উকিল পট্টি) ও লীনা গুপ্ত (তফন জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানির কোয়াটারে থাকতেন)। সহ সম্পাদিকা রূপে লক্ষীরাণী গুপ্তা (হিতেশ বিশ্বাস রোড, অম্বিকাপট্টি) ছিলেন আমার ছায়াসঙ্গী।''*[৩৩] 'কাছার মহিলা ত্রাণ সমিতি' সেদিন দুর্গতের সেবায় এগিয়ে এসেছিল। সেই সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে পেরে অনুরূপার অনুভূতিতে জেগেছে, *"এমনি করে দুঃস্থ মানুষদের মাঝখানে গিয়ে কাজ করে শান্তি ও তৃপ্তি পেলাম। এ যেন আমার সঞ্জীবনী সুধা। আবার ফিরে পাচ্ছি আমার চেনা প্রাণস্পন্দন। আবার আমি জেগে উঠছি, বৌমা, মা, বৌদি – এসব মধুর সম্পর্কের*

বাঁধনে শুধু নয়, আমি এখন অনেকেরই 'অনুদি'। আবার আমি নিজেকে ঘরের বাইরে নিয়ে যেতে পেরেছি, বাইরের খোলা হাওয়া, শব্দ সব এসে ঢুকছে আমার ঘরে। আর আমি ঘরের মধ্যে হাঁফিয়ে উঠছিনা।''[৩৪] কাজের মধ্য দিয়ে নিজের ব্যক্তি পরিচয় তৈরী করা। অন্তরস্থলের নারীসত্তাকে জাগিয়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা অনুরূপার পরবর্তী জীবনেও দেখা যায়। প্রতিকূলতার মধ্যে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৫ তে বাংলা নিয়ে এম.এ. পাশ করে অনুরূপা ১৯৬৮ এর ১৫ই জুলাই শিলচর মহিলা কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। তাঁর হাত থেকে বেরিয়েছে একাধিক কাব্য, প্রবন্ধ, গদ্য গ্রন্থ। ১৯৬১ এর ১৯শে মে পরবর্তী ভাষা আন্দোলনেও নিজেকে সামিল করেছিলেন। ১৯৭৯ তে আসামে নতুন করে *'বঙাল খেদা'* আন্দোলন শুরু হলে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ১৯৮০তে জন্ম হওয়া প্রগতিশীল লেখক শিল্পী ও কলাকুশলীদের সংগঠন 'দিশারী'র উদ্যোগেও সামিল হন অনুরূপা। সাহিত্য চর্চায় মেয়েদের উৎসাহিত ও সৃষ্টিশীল করে তুলতে ২০০০ সালে জন্ম হওয়া *'বরাকনন্দিনী সাহিত্য চর্চা কেন্দ্র'* গঠনের মুখ্য ভূমিকাতেও অনুরূপা অবতীর্ণ হন। সমাজের অবদমন অনুরূপাকে ব্যথা দিলেও অনুরূপার উদ্যোমি স্বভাবের কারণে সেই ব্যথা চিরস্থায়ী হতে পারেনি। নিজের মা, বোন নিকট আত্মীয় মেয়েদের জীবনে তিনি যে সামাজিক অবঘাত লক্ষ্য করেছিলেন তাকে নিজের জীবনে বড় হতে দিতে চান নি। সমাজকে জানান দিয়ে নিজের সংগ্রামী জীবনকে '*নানা রঙের দিন*'-এ তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাই আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গেই '*আমি এ মাটির কন্যা*' উচ্চারণের মধ্য দিয়ে আত্মজীবনী 'নানা রঙের দিনে'র সূচনা। সামাজিক অবদমনের মাঝেও যে তিনি নিজেকে গড়তে পেরেছিলেন এই বাক্যের মধ্যেই রয়েছে তাঁর বলিষ্ঠ উচ্চারণ, দৃপ্ত অঙ্গীকার।

তথ্যসূত্র

১। তপোধীর ভট্টাচার্য- 'আত্মকথায় নন্দন', অনুরূপা বিশ্বাসের 'নানা রঙের দিন' আত্মজীবনীর ভূমিকা অংশে লেখা নিবন্ধ, বরাকনন্দিনী প্রকাশনী, শিলচর, ২০০৭, পৃ: ৯।

২। অনুরূপা বিশ্বাস, নানা রঙের দিন (প্রথম খণ্ড), বরাকনন্দিনী প্রকাশনী, শিলচর, ২০০৬, পৃ: ১১।

৩। অনুরূপা বিশ্বাস, নানা রঙের দিন (প্রথম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭।

৪। ঐ, পৃ: ১৭।

৫। অনুরূপা বিশ্বাস, কিছু কিছু বৃক্ষ আছে বলে, বরাকনন্দিনী প্রকাশনী, শিলচর, ২০১৩, পৃ: ১২।

৬। অনুরূপা বিশ্বাস, নানা রঙের দিন (প্রথম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ: ৩।

৭। বর্ণমালা (প্রথম সংখ্যা), শিলচর, সেপ্টেম্বর ২০১২, পৃ: ৫।

৮। 'ছবি বসুর রচনা সংকলন', সম্পাদনা- যশোধরা বাগচী, দে'জ, ১৯৯৫, পৃ: ২৭৫।

৯। বর্ণমালা (প্রথম সংখ্যা), প্রাগুক্ত, পৃ: ৫।

১০। ঐ, পৃ: ৭।

১১। ঐ, পৃ: ৭।

১২। ঐ, পৃ: ৭।

১৩। ঐ, পৃ: ৮।

১৪। ঐ, পৃ: ৯।

১৫। ঐ, পৃ: ১০।

১৬। বর্ণমালা (প্রথম সংখ্যা), প্রাগুক্ত, পৃ: ১০।

১৭। ঐ, পৃ: ১০।

১৮। রাসসুন্দরী দেবী, আমার জীবন, নরেশ জানা ও অন্যান্য সম্পাদিত, আত্মকথা ১ম খণ্ড, অনন্য প্রকাশন, ১৯৮১, পৃ :২৭।

১৯। সরলা দেবী চৌধুরাণী, জীবনের ঝরা পাতা, রূপা, ১৯৭৫, পৃ: ১৮৬।

২০। সৈয়দা মনোয়ারা খাতুন, স্মৃতির পাতা, শারদীয় এক্ষণ, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ, পৃ: ১৩-১৪।

২১। অনুরূপা বিশ্বাস, নানা রঙের দিন (প্রথম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪।

২২। ঐ, পৃ: ৯-১০।

২৩। ঐ, পৃ: ১৮।

২৪। ঐ, পৃ: ২৩।

২৫। ঐ, পৃ: ২৯-৩০।

২৬। বর্ণমালা (প্রথম সংখ্যা), প্রাগুক্ত, পৃ: ৭।

২৭। ঐ, পৃ: ৭।

২৮। অনুরূপা বিশ্বাস, নানা রঙের দিন (প্রথম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৯।

২৯। ঐ, পৃ: ৯৫-৯৬।

৩০। অনুরূপা বিশ্বাস, নানা রঙের দিন (দ্বিতীয় খণ্ড), বরাকনন্দিনী প্রকাশনী, শিলচর, ২০০৭, পৃ: ৩১-৩২।

৩১। অনুরূপা বিশ্বাস, নানা রঙের দিন (দ্বিতীয় খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৬।

৩২। ঐ, পৃ: ৫৫।

৩৩। ঐ, পৃ: ৫৬।

৩৪। ঐ, পৃ: ৫৭।

জয়া মিত্র

(১৯৫০)